গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

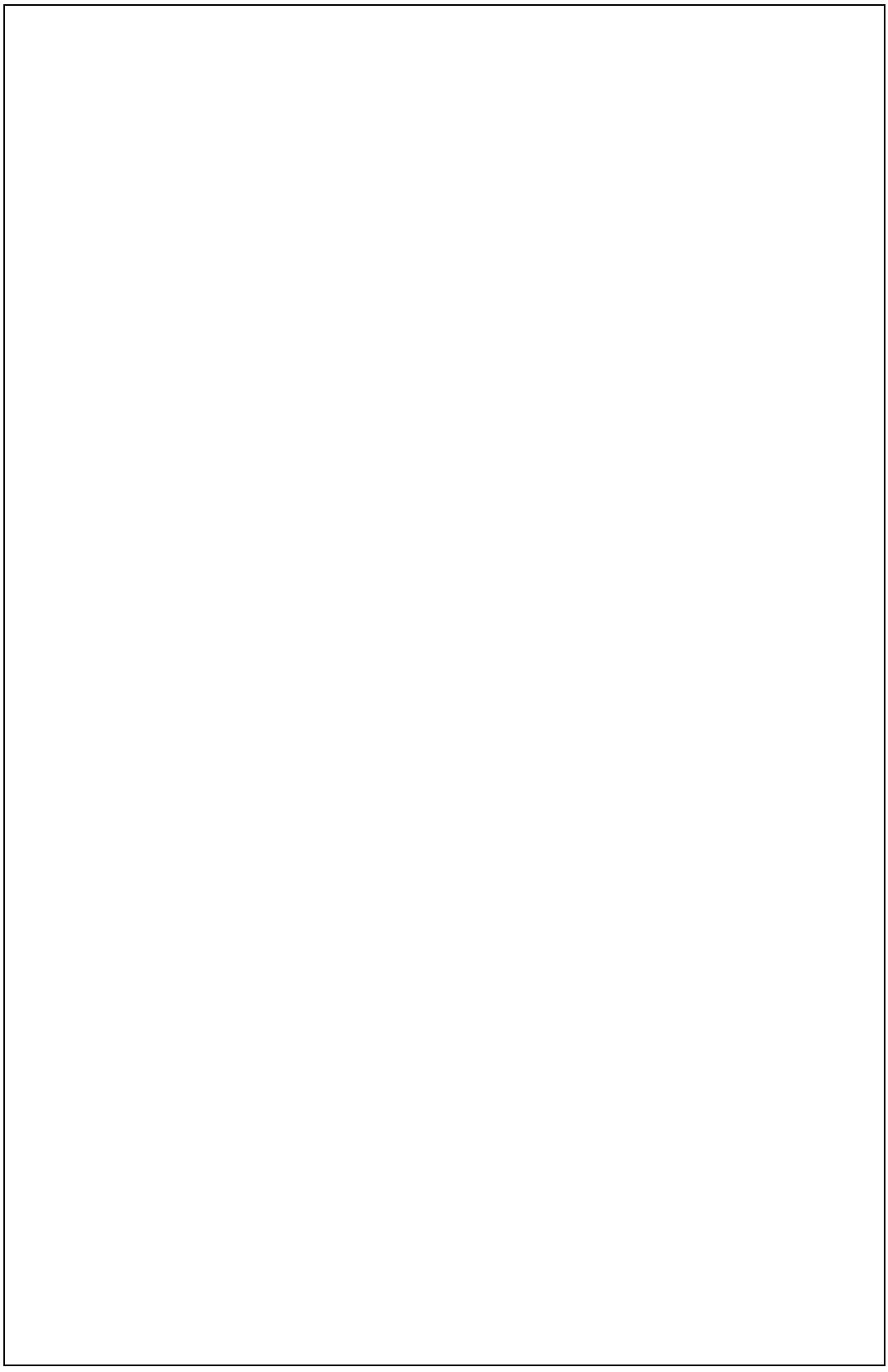

গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন

উপদেশক
মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
মোঃ ফজলুল কাদের

সম্পাদক
ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ

সম্পাদনা পর্ষদ
মোঃ আবু নাসির খান
কে. এম. মারুফুজ্জামান
মোঃ রবিউজ্জামান
মোঃ মাহমুদুজ্জামান

প্রকাশক
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, পিকেএসএফ

অর্থায়নে
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্প (এসইপি)

প্রকাশকাল
জুলাই ২০২০
প্রথম সংস্করণ, ১০০০ কপি

সূচিপত্র

১.০	ভূমিকা	৪
২.০	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ও গবাদিপশু পালন	৫
৩.০	বাংলাদেশে গবাদিপশুর উৎপাদিত বর্জ্য	৫
৪.০	গবাদিপশুর উৎপাদিত বর্জ্য: সম্পদ না সমস্যা	৬
৫.০	গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা	৭
৬.০	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা	৮
৭.০	গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	৯
পরিশিষ্ট ১:	বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রযুক্তি	১১
পরিশিষ্ট ২:	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এ উৎপাদিত স্লারি ব্যবস্থাপনা	১২
পরিশিষ্ট ৩:	ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার	১৪
পরিশিষ্ট ৪:	পিট কম্পোস্ট সার	১৬
পরিশিষ্ট ৫:	গো-মূত্র	১৭
পরিশিষ্ট ৬:	গবাদিপশু পালনের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ	১৯

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটিরও বেশি। দেশের প্রায় ৬৪ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে এবং তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল (বিশ্ব ব্যাংক,২০১৭)। কৃষির পাশাপাশি প্রতিটি পরিবার গবাদিপশু পালন করে যা এ দেশের মানুষের একটি অন্যতম আয়ের উৎস। গবাদিপশু পালনে স্বল্প জায়গার প্রয়োজন হয় বলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সহজেই গবাদিপশু পালন করতে পারে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% সারা বছর এবং ৫০% মৌসুম ভিত্তিক গবাদিপশু পালন করে থাকে (বিবিএস, ২০১৯)। অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকেও গবাদিপশু পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের জিডিপিতে গবাদিপশু পালনের অবদান ১.৫৪% এবং কৃষিখাতে এর অবদান প্রায় ১৩.৪৬% (বিবিএস, ২০১৯)।

বাংলাদেশে গবাদিপশু পালন সাব-সেক্টরে বিশেষ করে মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদনে উন্নতি করলেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুধ ও মাংসের ন্যায় গোবর ও গো-মূত্রেরও আর্থিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গবাদিপশু পালনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকারের প্রভাব রয়েছে। গবাদিপশু আমাদের প্রোটিন চাহিদার সিংহভাগের যোগানদাতা। গবাদিপশুর সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আর্থিক সুফলগুলো যেমন অর্জন করা যায় তেমনি পরিবেশের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব কমানো সম্ভব। এছাড়াও গবাদিপশু বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বাস্থ্যহানিসহ উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খামারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে পালনকৃত কৃষক গোবর ও গো-মূত্র পরিষ্কারে ব্যবহৃত পানি ও খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ গোয়ালঘর/খামার থেকে সরাসরি পুকুর, নদী, খাল অথবা রাস্তার পাশে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখে। ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। গবাদিপশুর খাবার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি সাধারণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও কৃষকের যথোপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানের অভাবে তাঁরা অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এমতাবস্থায়, পিকেএসএফ এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পশুপালনে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২.০ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ও গবাদিপশু পালন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এস,আর, ও নং ১৯৭-আইন/৯৭-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধিত-২০১৯) বা ইসিআর-৯৭ প্রণয়ন করে। এই বিধিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবশে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধিত-২০১৯) এর উপ-বিধি (১) এ তফসীল-১ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পকারখানা ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করে মোট চারটি শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। শ্রেণিসমূহ হলো- সবুজ; কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল। সবুজ শ্রেণিভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহের পরিবেশগত নেতিবাচক কোনো প্রভাব নেই। কমলা-ক ও কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহের পরিবেশের ওপর স্বল্প থেকে মধ্যম মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে যেগুলো সহজেই নিরাময়যোগ্য। লাল শ্রেণিভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহের নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং এই প্রভাব নিরসনের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। গবাদিপশু পালন কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যা বিবেচনায় এটিকে ভিন্ন ভিন্ন ২টি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন:

কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত	কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত
• গো-খামারে গরু বা মহিষের সংখ্যা শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টি বা এর নিচে এবং গ্রামে গরুর সংখ্যা ২৫টি বা এর নিচে	• গো-খামারে গরু/মহিষের সংখ্যা শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টির উর্ধ্বে এবং গ্রামাঞ্চলে গরুর সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) টির উর্ধ্বে

উল্লেখ্য, সকল শ্রেণিভুক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রয়োজন।

৩.০ বাংলাদেশে গবাদিপশুর উৎপাদিত বর্জ্য

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২.৫ কোটি গরু আছে (বিবিএস, ২০১৯) এবং প্রতিদিন গড়ে ২৩০ মিলিয়ন কেজি গোবর উৎপাদন হয় (ILMM Policy, 2015) যার অধিকাংশ পরিমান বর্জ্যে পরিণত হয়ে পরিবেশ দূষণ করে। এছাড়াও, একটি গরু দিনে গড়ে প্রায় ২.৫ কেজি খাবার নষ্ট করে যা বর্জ্য হিসেবে থেকে যায়। সুতরাং উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে সৃষ্ট বর্জ্যের পরিমাণ প্রতিদিন প্রায় ৬০ হাজার টন। গবাদিপশুর মূত্র এবং খামার পরিস্কার করা পানিও বর্জ্য হিসাবে পরিবেশ দূষিত করে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরু হতে প্রতিদিন গড়ে ৬-১২ লিটার মূত্র পাওয়া যায় সে হিসেবে দেশের ২.৫ কোটি গরু হতে প্রতিদিন প্রায় ২২.৫ কোটি লিটার গো-মূত্র উৎপাদিত হচ্ছে।

৪.০ গবাদিপশুর উৎপাদিত বর্জ্য: সম্পদ না সমস্যা

গবাদিপশুর খাবারের ৫৫ শতাংশই গোবরে পরিণত হয়। সুতরাং, গোবর একটি উৎকৃষ্ট যৌগ যাতে কৃষি কাজের উপযোগী এবং ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। কিন্তু মোট উৎপাদিত গোবরের তুলানায় এর ব্যবহার খুবই কম। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত গোবর দিয়ে ৪০ লক্ষ বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা যেতে পারে (প্রতিদিন ২.৪ কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদনে সক্ষম)। প্রতি কেজি গোবর থেকে ০.০৩৭ কিউবিক মিটার হিসেবে মোট উৎপাদিত গোবর থেকে প্রতি বৎসর প্রায় ২.৯৭ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে যার মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টন কেরোসিন, ৩০ লক্ষ টন কয়লা সাশ্রয় হবে এবং দেশের প্রায় ২০ ভাগ পরিবারের বাড়ির আলোর জন্য বিদ্যুৎ এবং রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত স্লারি বায়ো-ফার্টিলাইজার এবং বায়ো-পেস্টিসাইড হিসেবে ব্যবহার করা যায় (Jobaida et al, 2019)। অন্যদিকে, প্রতি কেজি গোবর হতে ৫০-৫২% কেঁচো সার উৎপাদন করা যায়, সে মোতাবেক দৈনিক ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন কেঁচো সার পাওয়া সম্ভব। প্রতি লিটার গো-মূত্রে ২.৫% ইউরিয়া থাকে, সে হিসাবে দৈনিক ৫ হাজার ৪০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন করা যেতে পারে। দেশে প্রতি বছর ২৯ লক্ষ মেট্রিক টন (২.৯ মিলিয়ন টন) ইউরিয়া চাহিদা থাকলেও উৎপাদিত হয় ৭ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন (০.৭২৫ মিলিয়ন টন)। সুতরাং গোবর ও গোমূত্রের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানী ও সারের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভুমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও, গোবরের এরূপ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস-অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নির্গমন কম হয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর দূষণের প্রভাব কমে যায়। উল্লেখ্য, গো-খাদ্যের উচ্ছিষ্ট বর্জ্যও একটি নির্দিষ্ট স্থানে পচিয়ে গোবরের সাথে মিশিয়ে বায়োগ্যাস বা কেঁচো সার উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়। কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কেঁচো সার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ আছে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে শুধু মাটির গুণাগুণই নষ্ট হয় না, উক্ত রাসায়নিক পদার্থের অবশিষ্টাংশ নদী, পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদিতে মিশে পানি দূষিত করে। ফলে মাছসহ জীব-বৈচিত্র্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে উৎপাদিত গোবরকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে কেঁচো সার উৎপাদন করে জমিতে ব্যবহার করলে তা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেমন সহায়তা করবে, তেমনি মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধিসহ পরিবেশ সংরক্ষণেও ভূমিকা রাখবে।

৫.০ বাংলাদেশে গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা

- বর্তমানে খামার বা পারিবারিক পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয় না।
- ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করলেও বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের স্লারির ব্যবস্থাপনা করা হয় না। গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পুকুর, ডোবা ও খালে বিক্ষিপ্তভাবে স্লারি ফেলা হয়, ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

চিত্র: রাস্তায় স্লারি ছড়িয়ে আছে।

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গোবর ও উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে সৃষ্ট বর্জ্য খামার সংলগ্ন গর্তে অপরিকল্পিতভাবে রাখা হয় এবং কিছুদিন পরে সার হিসাবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করা হয়। তবে এ সার অত্যন্ত নিম্ন মানের হয়।

চিত্র: সার তৈরির জন্য গোবর ও উচ্ছিষ্ট খাবার অপরিকল্পিতভাবে ভাবে রাখা হয়েছে।

- অধিকাংশ খামারিই কেঁচো সারের উৎপাদন ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত নন।
- রোদে শুকানো গোবর বসতবাড়ি পর্যায়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

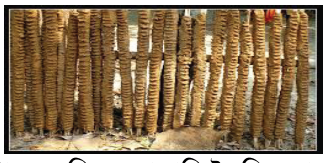

চিত্র: গোবর শুকিয়ে জ্বালানি তৈরি করা হয়েছে।

- বৃষ্টির পানির সাথে গোবর জলাশয়ে গিয়ে পানি দূষিত করে এবং পানির অক্সিজেন কমিয়ে দেয় ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চিত্র: গোবর জলাশয়ে গিয়ে পানি দূষণ করে।

- খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই এবং এ বিষয়ে সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন নন।
- গবাদিপশুর খামার পরিবেশ বান্ধব নকশা অনুযায়ী তৈরি নয়। বেশিরভাগ খামারে মল-মূত্র নিষ্কাশন-এর ড্রেন নেই এবং গবাদিপশুর ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের সুযোগ সীমিত।

চিত্র: অপরিকল্পিত গবাদিপশুর খামার

৬.০ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে সাধারণত পারিবারিক পর্যায়ে গবাদিপশু পালন করা হয়। অধিকাংশ পরিবার ২-৩টির (গরু বা মহিষের) গবাদিপশু পালন করে। ফলে সেসব পরিবারের গবাদিপশুর বর্জ্য স্বল্প পরিমাণ উৎপাদিত হয় যা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা কঠিন হয়। এ সমস্ত পরিবার সাধারণত গোবর শুকিয়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে বা উন্মুক্ত গর্তে ফেলে রাখে। পৃথক পৃথক পরিবারসমূহকে একত্র করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করাও একটি দুরূহ কাজ। তবে সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

৭.০ গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বর্জ্য পদার্থ	বর্তমান ব্যবহার	পরিবেশগত প্রভাব	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
০১।	গোবর	শুকনা জ্বালানী হিসাবে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।	প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) নির্গমণ হয় যা বায়ু দূষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে।	• গোবর থেকে গোবর সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরি করা যেতে পারে। • গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা যেতে পারে । • বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত স্লারি যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে।
		ছোট ছোট গর্ত বা উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়।	পুকুর, নদী ও খালের পানি দূষিত হয়।	• কেঁচো সার উৎপাদন করা যেতে পারে।
		গর্ত করে সংরক্ষণ ও সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।	পরিবেশের জন্য ভালো, তবে মিথেন নির্গমন হয়	• বাণিজ্যিকভাবে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ও ব্যবহার করা যেতে পারে।
		ভার্মি কম্পোস্ট	পরিবেশের জন্য ভালো	• বাণিজ্যিকভাবে ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার সম্প্রসারণ। করা যেতে পারে।
০২।	উচ্ছিষ্ট গো-খাদ্য	ছোট ছোট গর্ত বা উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়	বিভিন্ন কীট পতঙ্গের বংশ বিস্তার ত্বরান্বিত করে।	• বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও ব্যবহার
		শুকনা জ্বালানী হিসাবে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।	প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া (কার্বন ডাই-অক্সাইড) নির্গমন হয় যা বায়ু দূষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে	• বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও ব্যবহার

ক্রমিক নং	বর্জ্য পদার্থ	বর্তমান ব্যবহার	পরিবেশগত প্রভাব	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
০৩।	খামার ধৌত দূষিত পানি	সরাসারি পুকুর, খাল ও নালায় ফেলা হয়	পরিবেশ দূষিত হয়	• একটি নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। • গো-খামারের নকশায় পরিবর্তন করে গো-মূত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
০৪।	গো-মূত্র	সরাসারি পুকুর, খাল ও নালায় ফেলা হয়। এছাড়া বসতভিটার আশে পাশে বিচ্ছিন্নভাবে ফেলা হয়।	পরিবেশ দূষিত হয়	• একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঢাকনাসহ সোকওয়েল করে সেখানে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। • গো-মূত্র হতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জৈব সার ও জৈব বালাই নাশক পাউডার এবং/অথবা তরল তৈরি করা যেতে পারে। • জৈব কীটনাশক হিসেবে ফসলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। • গো-মূত্র ১০-১৪ দিন রেখে গাঁজন করে তার মধ্যে নিম ও তামাক পাতা, বিষকাঁঠালী ও ধুতরার নির্যাস মিশিয়ে বালাইনাশক হিসেবে প্রস্তুত করা যেতে পারে। • বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে গোবরের সাথে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।
০৫।	বায়োগ্যাস থেকে উচ্ছিষ্ট স্লারি	কোনো ব্যবস্থাপনা করা হয় না	গ্রামীণ রাস্তা-ঘাট এবং পানি দূষিত হয়	• ঢাকনা যুক্ত সোকওয়েল-এ সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং তা বায়ো-ফার্টিলাইজার, বায়ো-পেস্টিসাইড, কেঁচো সার/কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। • রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে (বর্ষাকালের জন্য উপযুক্ত নয়)।
০৬।	খামারে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, টিকা, ঔষধের অবশিষ্টাংশ	কোনো ব্যবস্থাপনা করা হয় না	বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ হতে পারে।	• নির্দিষ্টস্থানে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

পরিশিষ্ট ১
বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রযুক্তি

বায়োগ্যাস হলো পচনশীল জৈব বস্তু হতে উৎপাদিত একধরনের জ্বালানী গ্যাস। সব প্রাণীর মল ও পচনশীল আবর্জনা ব্যবহার করে এ গ্যাস উৎপাদন করা যায়। পশুর গোবর ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে পচানোর ফলে যে গ্যাস তৈরি হয় তাই হচ্ছে বায়োগ্যাস। তবে গৃহপালিত বা বাণিজ্যিকভাবে পালিত পশুপাখির মল সহজলভ্য বলে বায়োগ্যাস উৎপাদনে এগুলোই বেশি ব্যবহৃত হয়। বায়োগ্যাস বলতে আমরা প্রধানত মিথেন গ্যাসকেই বুঝে থাকি। বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট আবর্জনাটুকু উত্তম জৈব সার হিসেবে বেশ কার্যকরী।

বায়োগ্যাস তৈরির কাঁচামাল

যেকোন পচনশীল বস্তু বায়োগ্যাস তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন:

- মলমূত্র (মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি)
- শাকসবজি, তরকারি, ফল-মূল ও মাছ মাংসের ফেলনা অংশ
- লতাপাতা, বিভিন্ন আবর্জনা ও কচুরিপানা

বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা:

- অল্প জায়গায় প্ল্যান্ট তৈরি করা যায়।
- প্ল্যান্ট থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়া যায়।
- আবর্জনা মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা যায়।
- মশা-মাছি, রোগ-জীবাণু ছড়ায় না।
- রাধুনীর শারীরিক পরিশ্রম কম হয়।
- জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়।
- বায়োগ্যাস ব্যবহারের ফলে গ্রীন হাউস গ্যাসের নির্গমন কম হয়।

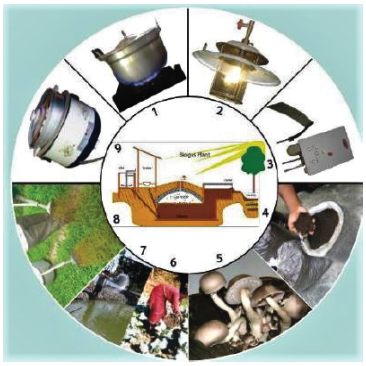

চিত্র: বায়োগ্যাসের ব্যবহার

পরিশিষ্ট-২
বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এ উৎপাদিত স্লারি ব্যবস্থাপনা

গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রান্না-বান্না ও বাল্ব জ্বালিয়ে আলো ব্যবহার করা হলেও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত স্লারির পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন রয়েছে। স্লারির পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা সহজ হলেও সচেতনতা ও জ্ঞানের অভাবে স্লারি উন্মুক্ত গর্তে, রাস্তার ধারে, খালের পাড়ে ফেলে রাখা হয়। স্লারি একটি উন্নতমানের জৈবসার যা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে স্লারির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব।

চিত্র: বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট-এ উৎপাদিত স্লারি

বায়োগ্যাস প্লান্ট এ উৎপাদিত স্লারির কিছু ব্যবহার

১. বায়োস্লারি সরাসরি সেচের পানির সাথে জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

চিত্র: সার হিসেবে স্লারি জমিতে ব্যবহার।

২. বায়োস্লারি শুকনো গুঁড়া সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

চিত্র: স্লারির শুকনো গুড়া।

বায়োগ্যাস প্লান্ট এ উৎপাদিত স্লারির কিছু ব্যবহার

৩. মাছের খাবার হিসেবে প্রয়োগ করা যায়।

চিত্র: মাছের খাবার হিসেবে স্লারির ব্যবহার।

৪. অন্যান্য কম্পোস্ট সার তৈরির শুরুতে গোবরের সাথে প্রয়োগ করা যায়।

৫. বালাইনাশক হিসেবে ফসলের মাঠে প্রয়োগ করা যায়।

চিত্র: বালাইনাশক হিসেবে স্লারির ব্যবহার।

৬. মাশরুম চাষে বায়োস্লারির ব্যবহার করা যায়।

চিত্র: মাসরুম চাষে স্লারির ব্যবহার

৭. খরা এলাকার ফসলে উপরি প্রয়োগ করা যায়।

পরিশিষ্ট ৩
ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার

কেঁচো কম্পোস্ট একটি জৈব সার যা জমির উর্বরতা বাড়াতে ব্যবহার করা হয়। একমাসের বাসি গোবর খেয়ে কেঁচো মল ত্যাগ করে এবং এর সাথে কেঁচোর দেহ থেকে রাসায়নিক পদার্থ বের হয়ে যে সার তৈরি হয় তাঁকে কেঁচো কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট বলা হয়। এটি সহজ একটি পদ্ধতি একমাসের বাসি গোবর দিয়ে ব্যবহার উপযোগী উৎকৃষ্ট জৈব সার তৈরি করা হয়। এ সার সব ধরনের ফসল ক্ষেতে ব্যবহার করা যায়।

চিত্রঃ কেঁচো সার

কেঁচো সার ব্যবহারের সুবিধা

- মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক কার্যাবলী বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাটিতে বায়ু চলাচল ক্ষমতা বাড়ায়, মাটির ঘনত্ব বৃদ্ধি করে এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।
- মাটির পানি ধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ফলে পানি সেচের চাহিদা কমায়।
- জমিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক মাত্রায় সরবরাহের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- কোঁচো মাটিতে বিভিন্ন ধরনের হরমোন, এনজাইম ও ভিটামিনের যোগান দেয় এতে উপকারী অনুজীবের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মাটির উর্বরতা দ্রুত বৃদ্ধি করে।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট মাটির বিষাক্ততা কমে; সাধারণ কম্পোস্ট সারের চেয়ে কেঁচো সারে পুষ্টিমান বেশি হওয়ায় জমির উর্বরতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

- ঠাণ্ডা ও ছায়ায় দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করা যায়। এতে সারের গুণাগুণ নষ্ট হয় না।
- মাটির পিএইচ সঠিক মাত্রায় রাখতে সহায়তা করে।
- অল্প পুঁজি এবং তুলনামূলক সহজ প্রযুক্তি হওয়ায় কৃষিতে কেঁচো সারের ব্যবহার ফসলের উৎপাদন খরচ কমায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
- জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস করে ফলে জমির কৃষি পরিবেশগত উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।
- গাছের শিকড় বৃদ্ধি করে ফলে মাটির অবক্ষয় কমে যায়।
- মাটির কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত সঠিক রাখার ফলে গাছ বা ফসল অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান সহজে গ্রহণ করতে পারে।

কেঁচো সারের ব্যবহার

- কেঁচো সার সব ধরনের ফসলে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে শাক সবজি উৎপাদনে এর উপযোগিতা অত্যন্ত বেশি।
- ফুলের আকার, উজ্জলতা ও আকর্ষণীয়তা বাড়ে এবং মোট উৎপাদন বেড়ে যায়।
- শহরাঞ্চলে টবে কেঁচো সার ব্যবহারে গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।
- মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- দানাদার ও তেল জাতীয় ফসলের দানা পুষ্ট করে এবং মোট ফলন বাড়ায়।
- কেঁচো সার ব্যবহারে ফলের আকার বাড়ে। ফল দেখতে আকর্ষণীয় হওয়ায় বাজার মূল্য বেশি পাওয়া যায়।
- পিট জাতীয় ফসলে ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জমি লবণাক্ততা প্রবন। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী পর্যায়ে বসতবাড়িতে সব্জি চাষের ক্ষেত্রে ছোট ছোট পাত্রে (মটকা, ভাঙ্গা কলস ইত্যাদি) অর্ধেক কেঁচো সার এবং অর্ধেক ভালো মাটি মিশিয়ে তাতে বিভিন্ন ধরনের সবজি (যেমন: মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া ইত্যাদি) আবাদে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

চিত্র: কেঁচো সার।

পরিশিষ্ট ৪
কম্পোস্ট সার

গবাদি পশুর খামার এর বর্জ্য, মল-মূত্র, হাঁস মুরগির বিষ্ঠা পচনের মাধ্যমে যে জৈব সার তৈরি হয় তাকে কম্পোস্ট সার বলা হয়।

কম্পোস্ট সার ব্যবহারের উপকারিতা

- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ও মাটির গুণাগুণ উন্নত হয়
- মাটির পানি/রস ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- মাটির বায়ু চলাচল বেড়ে যায় ও মাটির উপকারী জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ বেড়ে যায়
- গ্রীষ্মকালে মাটির তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় এবং শীতকালে মাটিকে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট মাটির বিষাক্ততা কমায়।

চিত্র : কম্পোস্ট সার।

চিত্র : শুকনা কম্পোস্ট সার।

পরিশিষ্ট ৫
গো-মূত্র (Cattle Urine)

গো-মূত্র গবাদিপশু পালন খাতের একটি মূল্যবান উপজাত। গবাদিপশুর মূত্রে কী কী উপাদান রয়েছে, কোন কোন অনুজীব রয়েছে এবং বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতি নির্ণয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে গবেষণা হয়েছে। গবাদিপশুর মূত্র জৈব সার হিসেবে অত্যন্ত কার্যকরী। গবাদিপশুর মূত্র প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে ঘনীভূত করে খামারীদের জন্যে সহজে পরিবহন, ব্যবহার এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিকেএসএফ-এর এক সমীক্ষায় জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক হিসেবে গোমূত্র ব্যবহারের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

সাধারণত ৩০০কেজি ওজনের একটি গরু দৈনিক ১২-১৩ লিটার মূত্র ত্যাগ করে। দেশে বর্তমানে ২.৫ কোটি গরু রয়েছে এবং এ সকল গরু থেকে প্রতিদিন প্রায় ২১.৬ কোটি লিটার গো-মূত্র পাওয়া যাচ্ছে যা হতে ৫,৪০০ মেট্রিক টন ইউরিয়ার সমান নাইট্রোজেন যোগান দেয়া সম্ভব। বিপুল পরিমাণ গো-মূত্রের একটি অংশও যদি জৈব সার ও বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাতে করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাবে। এতে করে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা পাবে পাশাপাশি উপজাতের উৎপাদনমুখী ব্যবহারের ফলে খামারীদের আয়ের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হবে। গোমূত্রে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বালাই দমনে কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের অনেক দেশে গোমুত্রের বাণিজ্যিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও বাংলাদেশে এর কোন উৎপাদনমুখী/বাণিজ্যিক ব্যবহার নাই। গো-মূত্রকে উৎপাদনমুখী/বাণিজ্যিক উপজাত হিসেবে বিবেচনা না করার জন্যে খামারীগণ একদিকে যেমন বাড়তি আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অপরদিকে এটি পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে।

চিত্র: প্যাকেটজাত শুকনা গো-মূত্র

জৈব কীটনাশক হিসেবে গবাদি পশুর মূত্র জমিতে প্রয়োগ

গো-মূত্র ব্যবহারের সুবিধা

১. গো-মূত্রকে প্রক্রিয়াজাতকরনের মাধ্যমে জৈব সার ও জৈব বালাই নাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২. গো-মূত্রে শতকরা ৯৫ ভাগ পানি, ২.৫ ভাগ ইউরিয়া এবং ২.৫ ভাগ খনিজ পদার্থ, লবণ, এনজাইম এবং হরমোন রয়েছে যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফলন বৃদ্ধি এবং মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ উদ্ভিদের ক্ষতিকর পোকা দমনে কার্যকরী।

৩. গো-মূত্রে বিদ্যমান হরমোনগুলো plant enhancer হিসেবে অতি উৎকৃষ্ট। প্রতি লিটার গোমূত্রে ১.৮-২.৪ গ্রাম ইউরিয়া, ২০-৩০ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন, ২০-৫০ মিলিগ্রাম ফসফেট, ১.৫-১.৮ গ্রাম পটাশিয়াম, ৫০-৩৬০ মিলিগ্রাম সালফার এবং ১.৭-২.৪ গ্রাম ক্লোরাইড পাওয়া যায়।

৪. গো-মূত্র ৪ দিন রেখে গাঁজন করলে ক্ষতিকর এ্যামোনিয়া অপসারিত হয় ও ইউরিয়ার উপস্থিতি বৃদ্ধি পায় যার ফলে জৈবসার হিসেবে এর উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

৫. গো-মূত্র ১০-১৪ দিন রেখে গাঁজন করে তার মধ্যে নিম ও তামাক পাতা, বিষকাঁঠালী ও ধুতরার নির্যাস মিশিয়ে বালাইনাশক প্রস্তুত করা হলে তাতে ক্লোরিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে এটি একটি ভালো মানের বালাইনাশক হিসেবে কাজ করে।

৬. গো-মূত্র সহজে বহন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারে উপযোগিতা সৃষ্টির জন্যে জৈব সার হিসেবে এটিকে শুষ্ক অবস্থায় পাউডার আকারে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া জৈব বালাইনাশক হিসেবে ঘনীভূত তরল পদার্থে পরিনত করা সম্ভব।

৭. গো-মূত্র প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত জৈব সার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদন খরচ ও ফসলে ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের আক্রমণও কম হয়। সর্বোপরি মাটির স্বাস্থ্য ভালো রেখে নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

৮ প্রক্রিয়াজাতকৃত গো-মূত্রে ক্লোরিনের আধিক্যের কারনে এটি ভালো মানের জৈব বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। উৎপাদিত জৈব সার ও জৈব বালাইনাশকটি ধান, পেঁপে, পুঁই শাক, মরিচ, ঢেঁড়স ইত্যাদি ফসলে প্রয়োগ করা যায়। এতে ফসলে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গের আক্রমণ কম হয় এবং ফসল উৎপাদনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।

পরিশিষ্ট ৬

গবাদিপশু পালনের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ (Environmental Monitoring)

কার্যকরী পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশগত পরিবীক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ যা পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অধিক টেকসই এবং ফলপ্রসু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশগত পরিবীক্ষণ একটি আবশ্যকীয় উপাদান। সাধারণত দুই ধরনের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় যথা:

১. প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য।
২. প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য।

পরিবীক্ষণের সময়

কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সাধারণত দুই ধাপে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ধাপ ১: কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়

কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় প্রশমন কার্যক্রমের (Mitigation measures) অগ্রগতি নিরীক্ষার জন্য এই পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্ণ সময়ে অন্তত একবার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে কার্যক্রম বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সময়ে এটা সম্পাদন করলে ভালো হয়। এ ক্ষেত্রে সংযুক্ত ফরমেট অনুযায়ী অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করতে হবে।

ধাপ ২: কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরবর্তী

প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তার কার্যকারিতা বোঝার জন্য এই ধরনের পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কার্যক্রমের সকল ধাপ সম্পন্ন হলে এই পরিবীক্ষণ করতে হবে। বছরে দুইবার অর্থাৎ প্রতি ছয় মাস পর পর এটা সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋতুগত পরিবর্তন একটি বিবেচ্য বিষয়।

পরিবীক্ষণের দায়-দায়িত্ব

কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার পরিবেশ বিষয়ক মনোনীত ব্যক্তি (Focal point) অথবা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ পরিবেশগত পরিবীক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। পরিবেশ বিষয়ক মনোনীত ব্যক্তি কার্যক্রম/প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কাছে পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

কমিউনিটি পরিবীক্ষণ

পরিবেশগত পরিবীক্ষণের অন্য একটি মাধ্যম হলো কমিউনিটি পরিবীক্ষণ। এই পরিবীক্ষণে সাধারণত কমিউনিটির লোকজন স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারীতা যাচাই করবেন। সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দলনেতা পরিবেশ বিষয়ক মনোনীত ব্যক্তির সহায়তায় এই পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করবেন। এক্ষেত্রে সংযুক্ত ছকের বিষয়ে পরিবেশ বিষয়ক মনোনীত ব্যক্তি কমিউনিটির দলনেতাকে সাহায্য করবেন। কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে এই পরিবীক্ষণ সম্পন্ন হবে। পরিবেশ বিষয়ক মনোনীত ব্যক্তি কমিউনিটি পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

চিত্রঃ কমিউনিটি সভা

প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা তৈরি

পরিবেশ বিষয়ক মনোনীত ব্যক্তি বা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

ছক-১
অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণের জন্য নির্ধারিত প্রশমন কার্যক্রম	অগ্রগতি (সমাপ্ত, চলমান, অসমাপ্ত)	পর্যবেক্ষণ	পরবর্তী পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা		পরিবীক্ষণের সংঘটনমাত্রা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
			হ্যাঁ	না		

পর্যবেক্ষণের সারসংক্ষেপ:

ছক পূরণকারী	যাচাইকারী
নাম:	নাম:
পদবি:	পদবি:
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
তারিখ:	তারিখ:

ছক-২
পরিবেশগত ফলাফল পরিবীক্ষণ

কার্যক্রম/প্রকল্প সম্পাদনের তারিখ:

গ্রামের নাম: ইউনিয়নের নাম:

উপজেলা: জেলা:

প্রথম খণ্ড : সাধারণ তথ্য

কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	পরিবেশগত বেইজলাইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

দ্বিতীয় খণ্ড: পরিবেশগত ফলাফল পরিবীক্ষণ

ক্রম	পরিবীক্ষণের জন্য নির্ধারিত প্রশমন কার্যক্রম	ফলাফল পর্যবেক্ষণ			ফলাফলের বর্ণনা	পরবর্তী পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	
		ভালো	খারপ	নাই		হ্যাঁ	না

ছক-৩
কমিউনিটি পরিবীক্ষণ
(কমিউনিটি লোকদ্বারা পূরণ করতে হবে)

অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

পরিবেশগত সমস্যা	সংশ্লিষ্ট প্রশমন কার্যক্রম	অগ্রগতি (সমাপ্ত, চলমান, অসমাপ্ত)	প্রশমন সমস্যা			মন্তব্য
			সমাধান হয়েছে	সমাধান হয়নি	প্রযোজ্য নয়	

পর্যবেক্ষণের সারসংক্ষেপঃ

ছক পূরণকারী	যাচাইকারী
নামঃ	নামঃ
পদবিঃ	পদবিঃ
স্বাক্ষরঃ	স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ	তারিখঃ

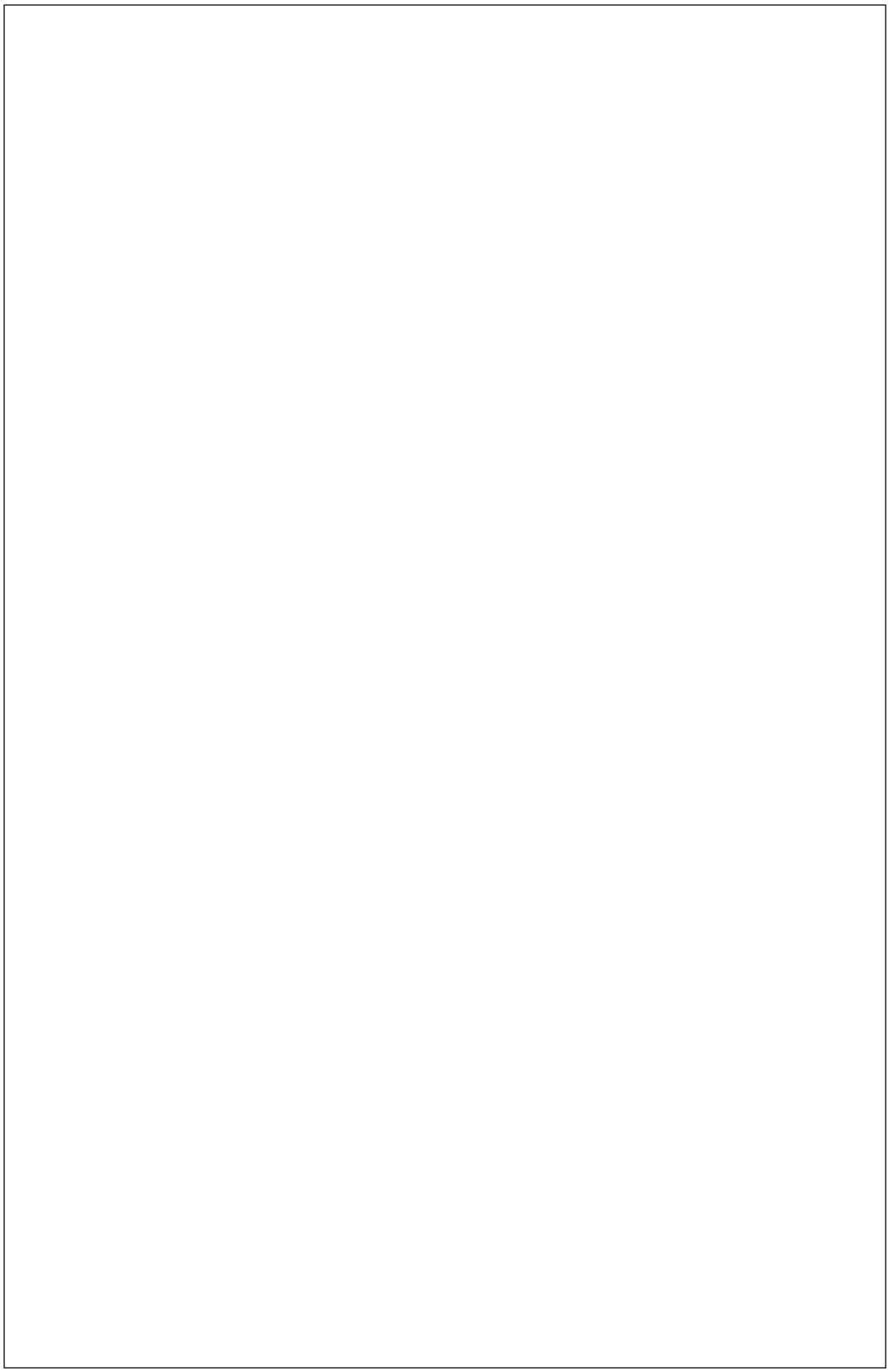

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ০২-৮১৮১১৬৯, ০২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৬৭১, ০২-৮১৮১৬৭৮ ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: pksf-bd.org, www.facebook.com/pksf.org